প্রশ্ন : বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলি উল্লেখ কর। ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাগুলির পরিচয় দাও।

বাংলা একটা প্রাণবন্ত চলমান ভাষা। বহু বছরের ধীর ও ধারাবাহিক বিবর্তনে বাংলা ভাষার বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণের মূল ধ্বনির নানা পরিবর্তন ঘটেছে। ধ্বনির পরিবর্তনশীলতা বাংলা ভাষাকে আরো আন্তরিক ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে যে যে কারণগুলি রয়েছে সেগুলি হল —

বাহ্যিক কারণ :

১. ভৌগোলিক অবস্থান : ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের পরিবেশ-পরিমণ্ডল আবহাওয়া ইত্যাদি নির্ভর করে এবং এ-সমস্তই স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে একই ধ্বনির উচ্চারণে স্থানবিশেষে ঈষৎ পার্থক্য দেখা দিতে পারে। তবে ভাষাবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি, তাঁরা ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবকে গৌণ কারণ বলে গ্রহণ করেছেন।

২. ভিন্ন জাতির ভাষার প্রভাব : একটি জাতি দীর্ঘকাল অন্য কোনো জাতির শাসনাধীনে থাকলে কালক্রমে শাসক-জাতির ভাষা শাসিত-জাতির ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর ফলে একের ভাষা অপরের ভাষা থেকে একদিকে যেমন শব্দ ও বাগ্ধারা, অন্যদিকে তেমনি উচ্চারণ-রীতি ও ধ্বনি গ্রহণ করে। এজন্য গ্রহণকারী ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে চলিত ভাষায় শ, য ও স এই তিন প্রকার শিধ্বনির মধ্যে মূল ধ্বনি হিসাবে শ-ই প্রধান; কিন্তু পূর্ববঙ্গে মধ্যযুগ থেকে মুসলমান-শাসনের প্রভাবের ফলে ফরাসি ভাষার প্রভাবে স-এর প্রাধান্য দেখা যায়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সেখানকার বাংলায় স-কে মূল ধ্বনি হিসেবে স্বীকার করেন। বাংলায় পদান্তে যুক্তব্যঞ্জন স্বরধ্বনি ব্যতিরেকে উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন: দ্বন্দ্ব (দ্বন্দ্বো), বদ্ধ (বদ্ধো)। কিন্তু বর্তমান হিন্দি ভাষার প্রভাবে কোথাও কোথাও পদান্তের যুক্তব্যঞ্জন হসন্ত ব্যঞ্জনের মতো উচ্চারিত হচ্ছে; যেমন- 'ধর্মঘট' অর্থে 'বন্ধ'।

৩. সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব : ধ্বনিসৃষ্টি ও ধ্বনি-লোপ: এ-পর্যন্ত যে-সব কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল এগুলি সবই বাহ্য কারণ। ভাষার অভ্যন্তরীণ কারণেও ধ্বনিপরিবর্তন হয়। একই ভাষার একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একটি শব্দের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তন হয়; আবার, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে নূতন ধ্বনির সৃষ্টি বা ধ্বনির লোপও হয়। যেমন- পদ্ম পদ্দ। বৈদিক সংস্কৃতের ঌ-কার লোপ পায়, বাংলায় এর ব্যবহার নেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মূর্ধন্য-ণ ও অন্তস্থ-ব বাংলায় লোপ পেয়েছে; অন্যদিকে ড়, ঢ় (বড়, দৃঢ়) এবং অ্যা (গেল- গ্যালো, এমন- এ্যামন) বাংলায় এই নূতন ধ্বনিগুলির সৃষ্টিও হয়েছে।

৫. ব্যক্তিগত প্রভাব: কোন স্থান, পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণপ্রবণতা অন্য কোন ব্যক্তির উচ্চারণে বা ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। 'শ'-এর উচ্চারণ এর ফলেই 'স' হয়ে যায়। 'র', 'ড়' বা 'ড়' 'র' হয়ে যায়। বাঁদর'- 'ন' ও'র'-এর মাঝখানে 'দ' ধ্বনিটি এসে গেছে অনবধানতার জন্যই। '

আভ্যন্তরীণ কারণ :

১. বাগ্যন্ত্রের ত্রুটি: জিহ্বার জড়তা থাকলে অনেক সময় সঠিক ধ্বনি উচ্চারণে ত্রুটি দেখা যায়। সংস্কৃত 'য' আমরা উচ্চারণ করতে পারি না, উচ্চারণ করি 'শ', 'ণ'-ও 'ন' উচ্চারণ করি।

২. শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি: শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি থাকলে তিনি এক শোনেন, অন্য উচ্চারণ করেন। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। তবে সামগ্রিক ভাষার ওপর এর প্রভাব গৌণ।

৩. উচ্চারণে দ্রুততা: দ্রুত উচ্চারণ করবার প্রবণতা থেকে শব্দমধ্যস্থ কোন কোন ধ্বনি অনুচ্চারিত থেকে যায়। যেমন: কোথা থেকে কোথেকে, কিরকম > কিরম ইত্যাদি।

৪. উচ্চারণে অক্ষমতা: অনেকে দুরূহ শব্দ ও বিদেশী শব্দের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ করেন, তার ফলে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। মূর্খ কালিদাস পরে পণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু কিংবদন্তী এই যে তিনি সরস্বতীর বরলাভ করবার আগে স্ত্রীর সামনে 'উষ্ট্র' উচ্চারণ করতে গিয়ে 'উট্র' উচ্চারণ করেছিলেন। এখন অনেকে 'বক্স' (Box) উচ্চারণ করে 'বাক্স', 'পিশাচ'- 'পিচাশ' ইত্যাদি।

৫. শ্বাসাঘাত: শব্দের মধ্যে সঠিক স্থানে শ্বাসাঘাত না-পড়ায় ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন: অলাবু > লাউ; গামোছা > গামছা ইত্যাদি।

৬. অল্পায়াসপ্রবণতা: শব্দের উচ্চারণে আয়াস এড়াতে এবং সহজতা আনতে অনেক সময় অজান্তে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে বসা হয়। তেমনি জন্ম জনম (স্বরভক্তি), স্কুল > ইস্কুল (স্বরাগম), মধু> মউ (ধ্বনিলোপ), কর্ম কম্মো (দুটি আলাদা ব্যঞ্জনকে একই ব্যঞ্জনে পরিণত করে)।

ধারাঃ উপরিউক্ত সমস্ত কারণগুলি মাথায় রেখে ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনি পরিবর্তনকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল —

(১) ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম

(২) ধ্বনির লোপ বা ধ্বন্যালোপ

(৩) ধ্বনির স্থানান্তর

(৪) ধ্বনির রূপান্তর।

(১) ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম : উচ্চারণকে সহজ ও সরল করবার জন্য বা উচ্চারণের অক্ষমতার জন্য যখন কোন শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে নতুন কোনো ধ্বনির আগমন ঘটে, তখন সেই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনকে ধ্বন্যাগম বলে। এই ধ্বন্যাগম দুই প্রকারের যথা (i) স্বরাগম ও (ii) ব্যঞ্জনাগম।

(i) স্বরাগম - শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগমন ঘটে তখন তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন প্রকারের—

(ক) আদি স্বরাগম— যেমন স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্টেশন > ইস্টিশন, স্টেট > এস্টেট। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে আ, ই, এ ধ্বনির আগমন ঘটেছে।

(খ) মধ্য স্বরাগম— শ্লোক > শোলোক, রত্ন > রতন, প্রীতি > পিরীতি -এখানে শব্দের মধ্যে ও, অ , ই ধ্বনিগুলির আগমন ঘটেছে।

(গ) অন্ত স্বরাগম— বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, ল্যাম্প > ল্যাম্পো প্রভৃতি -এখানে ই, ও অ স্বরধ্বনি গুলো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

(ii) ব্যঞ্জনাগম - শব্দ মধ্যে যখন ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে ব্যঞ্জনাগম। ব্যঞ্জনাগম ও তিন প্রকার — (ক) আদি, (খ) মধ্য ও (গ) অন্ত ব্যঞ্জনাগম।

(ক) আদি ব্যঞ্জনাগম—উজু > রুজু , ওঝা > রোজা , এখানে শব্দের আদিতে 'র' এর আগমন ঘটেছে।

(খ) মধ্য ব্যঞ্জনাগম— অম্ল > অম্বল, বানর > বান্দর, পোড়ামুখী > পোড়ারমুখী প্রভৃতি। এখানে ব, দ, র ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি শব্দের মধ্যে এসেছে।

(গ) অন্ত ব্যঞ্জনাগম— সীমা > সীমানা , ধনু > ধনুক, নানা > নানান - শব্দের শেষে 'না', 'ক', 'ন' বর্ণের আগমন ঘটে শব্দগুলিকে সরলীকরণ করা হয়েছে।

(২) ধ্বন্যালোপ : ধ্বনির আগমন ঘটিয়ে যেমন ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে ধ্বনির লোপ ঘটিয়ে শব্দের কাঠিন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যুগ্মশব্দ বা বড় বড় শব্দগুলিকে সরলীকরণ করে ছোট করা হয়েছে।

ধ্বনিলোপ দুই প্রকারের যথা — (i) স্বরলোপ ও (ii) ব্যঞ্জনলোপ। স্বরলোপ আবার তিন প্রকারের যথা — (ক) আদি স্বরলোপ , (খ) মধ্য স্বরলোপ ও (গ) অন্ত স্বরলোপ।

(ক) আদি স্বরলোপ— যেমন অলাবু > লাউ, অভ্যন্তর > ভিতর, উদ্ধার > ধার। এখানে প্রথম ধ্বনিগুলো লোপ পেয়েছে।

(খ) মধ্য স্বরলোপ— যেমন গামোছা > গামছা, ভগিনী > ভগ্নী , জানালা > জানলা। এইসব শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনি গুলির লোপ হয়েছে।

(গ) অন্ত্য স্বরলোপ— যেমন আশা > আশ, জলপানি > জলপান, কালি > কাল, ফাঁসি > ফাঁস প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলি লোপ পেয়েছে।

এই রকম ভাবে শব্দের মধ্য ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনির ও লোপ ঘটিয়ে শব্দের কাঠিন্য ভেঙে সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। আদি ব্যঞ্জনালোপের ব্যবহার বাংলা ভাষায় তেমন প্রচলন নেই কিন্তু মধ্য ও অন্ত ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণ বহু রয়েছে। যেমন— মরছে > মচ্ছে, নবধর > নধর , গোষ্ঠ > গোঠ প্রভৃতি শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনগুলি লুপ্ত হয়েছে। আবার মালদহ > মালদা, আল্লাহ > আল্লা, ছোটকাকা > ছোটকা, আলোক > আলো প্রভৃতি শব্দে শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

র-কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক>তক্ক, করতে>কত্তে, মারল>মাল্ল, করলাম>কল্লাম।

হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন : পুরোহিত >পুরুত, গাহিল>গাইল, চাহে>চায়, সাধু>সাহু>সাউ, আরবি-আল্লাহ>বাংলা-আল্লা, ফারসি-শাহ্>বাংলা-শা ইত্যাদি।

সমাক্ষর লোপঃ একই ধ্বনি একই শব্দে একের বেশি থাকলে সেগুলোর একটি মাত্র অবশিষ্ট থেকে অন্যগুলো লোপ পাওয়ার রীতিকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন: ছোটদিদি>ছোটদি, বড়দিদি>বড়দি, ছোটদাদা>ছোটদা, বড়কাকা>বড়কা ইত্যাদি।

(৩) ধ্বনির স্থানান্তর : শব্দমধ্যস্থ একাধিক স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি বিভিন্নভাবে স্থান পরিবর্তন করে যখন তখন তাকে বলা হয় ধ্বনির স্থানান্তর। এই স্থানান্তর প্রধানত দুই প্রকার যথা— (ক) অপিনিহিতি ও (খ) ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাস।

(ক) অপিনিহিতি—শব্দ মধ্যস্থ ব্যঞ্জনধ্বনির পর যদি ই-কার বা উ-কার থাকে, তবে সেই ই-কার বা উ-কার ঐ ব্যঞ্জনধ্বনির আগে উচ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে। যেমন —আজি > আইজ, কালি > কাইল, সাধু > সাউধ, আশু > আউস প্রভৃতি (আ + জ + ই > আ + ই + জ)। এছাড়া য-ফলা যুক্ত শব্দ বা 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলেও ই-কার আগে উচ্চারিত হয়। বাক্য > বাইক্য, লক্ষ্ > লইক্ষ কন্যা > কিইন্যা প্রভৃতি। অপিনিহিতি বাংলার বঙালী উপভাষায় প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। এই বঙালী উপভাষা বাংলাদেশে প্রচলিত হয় বেশি।

(খ) ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাস—উচ্চারণের সময় অসাবধানতাবশত বা অক্ষমতার কারণে শব্দ মধ্যস্থ সংযুক্ত বা পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান পরিবর্তন করার ঘটনাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন বাক্স > বাস্ক, পিশাচ > পিচাস, বাতাসা > বাসাতা, তলোয়ার > তরোয়াল, দহ > হ্রদ, রিকশা > রিশকা প্রভৃতি।

(৪) ধ্বনির রূপান্তর: শব্দ মধ্যস্থ একটি স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি রূপান্তরিত হয়ে যথাক্রমে অন্য কোনো স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে ধ্বনির রূপান্তর বলে। ধবনি রূপান্তরের পদ্ধতিগুলি হল -

ক) স্বরসঙ্গতিঃ সংগতি শব্দের অর্থ সাম্যভাব।স্বরসঙ্গতি হলো অসম স্বরধ্বনির সাম্য বা সংগতি লাভ। একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দের অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: শিয়াল>>শেয়াল, ইচ্ছা>>ইচ্ছে, ধুলা>>ধুলো ইত্যাদি। স্বরসঙ্গতি চার প্রকার। যেমন:

প্রগতঃ আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: শিকা>>শিকে, মুলা>>মুলো, পূজা > পুজো , নৌকা> নৌকো, কুমড়া> কুমড়ো ইত্যাদি।

পরাগতঃ অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: দেশি>>দিশি, বিড়াল> বেড়াল, শিয়াল> শেয়াল, শুনা> শোনা ইত্যাদি।

মধ্যগতঃ আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: বিলাতি>>বিলিতি , ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি> জিলিপি ইত্যাদি।

অন্যান্যঃ আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর এই দু'স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন: মোজা>>মুজো , ধোঁকা> ধুঁকো ইত্যাদি।

খ) অপিনিহিতি : অপি শব্দের অর্থ পূর্বে এবং নিহিতি শব্দের অর্থ স্থাপন। অপিনিহিতি শব্দের অর্থ পূর্বে স্থাপন।ধ্বনি পরিবর্তনের এই পারিভাষিক নাম দিয়েছেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শব্দস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্তী ই-কার বা উ-

কার যথাস্থানে উচ্চারিত না হয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি>আইজ, সাধু>সাউধ, রাখিয়া>রাইখ্যা।

গ) অভিশ্রুতি : অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর অভিশ্রুতি। অপিনিহিতি প্রভাবজাত ই বা উ শব্দ মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে যে আভ্যন্তরীণ সন্ধি ঘটায় তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: রাখিয়া>>রাইখ্যা>>রেখে, বাদিয়া>>বাইদ্যা>>বেদে, মাছুয়া>>মাউছুয়া>>মেছো, মাটিয়া> মাইট্যা> মেটে ইত্যাদি।

ঘ) ব্যঞ্জনসংগতি বা সমীকরণ বা সমীভবন : শব্দমধ্যস্থ দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনি সমব্যঞ্জনে পরিণত হলে তাকে সমীভবন বা ব্যঞ্জনসংগতি বলে। যেমন : জন্ম>জম্ম, গল্প> গপ্প, ইত্যাদি। সমীভবন তিন প্রকার-

প্রগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন ঘটে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন : চক্র>চক্ক, পক্ক >পক্ক, পদ্ম>পদ্দ, ইত্যাদি।

পরাগত সমীভবন : পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন : গল্প > গপ্প, সর্প > সপ্প , তৎ+জন্য>তজ্জন্য, ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।

অন্যোন্য সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমন : বৎসর > বছর , মহোৎসব > মোচ্ছব ইত্যাদি।

ঙ) বিষমীভবন বা অসমীকরণঃ

শব্দ মধ্যস্থিত দুটি সমধ্বনির একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিষমীভবন বা অসমীকরণ বলে। যেমন: শরীর>>শরীল, লাল>>নাল, ললাট>>নলাট ইত্যাদি।

চ) নাসিক্যীভবনঃ নাসিক্যব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ব স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হলে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন: চন্দ্র > চাঁদ, শঙ্খ > শাঁখ, পঞ্চ > পাঁচ , অঙ্ক > আঁক ইত্যাদি।

ছ) স্বতোনাসিক্যীভবনঃ শব্দস্থিত নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ না পেয়েও যদি সানুনাসিক স্বর হয় তবে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে।যেমনঃ পুস্তক> পুথি> পুঁথি, হাসপাতাল> হাঁসপাতাল।

জ) বর্ণ বিকৃতিঃ উচ্চারণকালে শব্দস্থিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নতুন রূপ লাভ করলে তাকে বর্ণ বিকৃতি বলে। যেমন: কপাট>>কবাট, ধোপা>>ধোবা, কাক>>কাগ ইত্যাদি।

ঝ) ক্ষীণায়ন বা অল্পপ্রাণীভবন : শব্দ মধ্যস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষীণায়ন বলে। যেমন: পাঁঠা>>পাঁটা, কাঠ>>কাট ইত্যাদি।

ঞ) পীনায়ন বা মহাপ্রাণীভবন : শব্দ মধ্যস্থিত কোন অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে পীনায়ন বলে। যেমন: কাঁটাল>>কাঁঠাল, পুকুর>>পুখুর ইত্যাদি।

ট) ঘোষীভবন : অঘোষ বর্ণ সঘোষ বর্ণের প্রভাবে সঘোষ বর্ণে পরিণত হলে তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন- চাকদহ> চাগদা

ঠ) স্বতোঘোষীভবন : অঘোষ বর্ণ কোনো সঘোষ বর্ণের প্রভাব ছাড়াই ঘোষ বর্ণে পরিণত হলে তাকে স্বতোঘোষীভবন বলে। যেমনঃ কাক> কাগ, ছাত> ছাদ, শাক> শাগ

ড) অঘোষীভবন : ঘোষ বর্ণ অঘোষ বর্ণে পরিণত হলে তাকে অঘোষীভবন বলে।যেমনঃ বড়ঠাকুর> বটঠাকুর, বাবু> বাপু, বীজ> বিচি ইত্যাদি।

ণ) মূর্ধন্যীভবন- কোন মূর্ধন্য ধ্বনির (ল,র,ষ,ট,ঠ,ড,ঢ,ণ,ড়,ঢ়) ওভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোন দন্ত্য ধ্বনি (ত,র,দ,ধ,না)যদি মূর্ধন্য ধ্বনি তে পরিণত হয় তবে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন - বিকৃত>বিকট ('ঋ' এর প্রভাবে 'ত' 'ট' হয়েছে), বৃদ্ধ> বুড়া, উৎ+ডীন=উড্ডীন

ত) তালব্যীভবন- তালব্য ধ্বনির প্রভাবে কোন দন্ত্য ধ্বনি বা অন্য কোন ধ্বনি যদি তালব্য ধ্বনি তে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে তালব্যীভবন বলে। (ই,ঈ,ত,এ,জ,ও,ঞ,শ,য় তালব্য ধ্বনি)। যেমন- সন্ধ্যা >সঞঝা>সাঁঝ (এখানে য-ফলার প্রভাবে 'ন' এবং 'ধ ' যথাক্রমে 'ঞ' এবং 'ঝ' পরিণত হয়েছে)।

থ) উষ্মীভবন - কোন ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি এবং আংশিক বাধা পেলে উষ্মধ্বনি হয়।স্পর্শ ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি শ্বাসবায়ু আংশিক বাধা পায় তবে স্পর্শধ্বনি উষ্ম ধ্বনি তে পরিবর্তন হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে উষ্মীভবন বলে। যেমন- কালীপূজা >চট্টগ্রামের উচ্চারনে খালী ফুজা। গাছতলা >গাসতলা , খেয়েছে >খাইসে

দ) সংকোচন -উচ্চারণের দ্রুত তার জন্য অনেক সময় আমরা কোন শব্দের সবকটি ধ্বনি পূর্ণরূপে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করি। একে সংকোচন বলে। যেমন - পরিষদ >পর্ষদ , পেঁয়াজ >প্যাজ ,যা ইচ্ছা তাই> যাচ্ছেতাই

ধ) বিস্ফোরণ -শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য কোন শব্দের ধ্বনি কে বাড়িয়ে উচ্চারণ করলে তাকে বিস্ফোরণ বা প্রসারণ বলে। যখন পর্তুগিজ পেরা> বাংলা পেয়ারা

ন) সাদৃশ্য- কোন দুটি সদৃশ্য শব্দের কোন একটিতে যদি কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে তবে অপর শব্দটিতে ঐ রূপ পরিবর্তন প্রত্যাশিত, এই বোধ থেকেই সাদৃশ্যের জন্ম। যখন আমরা কোন শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে অনুরূপ কোন নতুন শব্দ গড়ে নি ই তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সাদৃশ্য। যেমন - টাকার কুমির (কুবেরের সাদৃশ্য)। বধুটিকা>বুড়ি , এর সাদৃশ্য ঝিউড়ি ,শাশুড়ি।

প) বিমিশ্রণ/মিশ্রণ :- কোন একটি শব্দ ব্যবহার কালে ধ্বনি সারূপ্যের ফলে অপর শব্দ সেই রূপ লাভ করলে বিমিশ্রণ হয়। রস শব্দের সাদৃশ্যে অপরিচিত পর্তুগিজ শব্দ অনানস হলো আনারস। পিপাসা>পিয়াসা, তৃষ্ণা>তিয়াষ।

ফ) সংকর শব্দ:- বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগ করে একটি নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সংকর শব্দ বা মিশ্র শব্দ বলে। যেমন ইংরেজি শব্দ মাস্টার + বাংলা প্রত্যয় ই = মাস্টারি, পর্তুগিজ পাও +হিন্দি রোটি = পাউরুটি

ব) লোকনিরুক্তি: কোনো শক্ত-শব্দ বা অপরিচিত শব্দ যখন লোক-সাধারণের উচ্চারণে অল্পবিস্তর ধ্বনি-সাম্যের সুযোগ পেয়ে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করে, তখন তাকে লোকনিরুক্তি বলে। যেমন: "হাঁসপাতাল" । এটি এসেছে ইংরেজি Hospital শব্দ থেকে।যার প্রাচীন উচ্চারণ ছিল "হাসপিটাল"।সাধারণ লোক "হাসপিটাল" উচ্চারণ করতে পারতোনা।তারা "হাসপিটালে"-র প্রথম অংশ 'হাস' এর সাদৃশ্য পেলো 'হাসে'-র সাথে;আর 'পিটালে'-র সাদৃশ্য পেলো 'পাতালে'-র সাথে।তখন তারা "হাস-পিটাল" কে উচ্চারণ করল "হাঁসপাতাল"। এই হাসপিটাল বা হসপিটালকে হাঁসপাতাল রূপে উচ্চারণ-ই হল লোক নিরুক্তি। এছাড়াও---

২)লজেন্স(Lozenges)থেকে ল্যাবেনচুশ।

৩)আর্মচেয়ার(armchair) থেকে আরামচেয়ার।

৪)হিন্দি "শোভন পাপড়ি" থেকে শনপাপড়ি।

৫)সংস্কৃত "ভ্রমার্থী" থেকে ভিমরথী ইত্যাদি।

ভ) জোড়কলমশব্দ : একটি শব্দের সঙ্গে বা তার অংশ বিশেষের সঙ্গে, যদি অন্য অকটি শব্দ বা তার অংশ বিশেষ যুক্ত হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরী হয়, তবে তাকে জোড়কলম শব্দ বলে ।

উদাহরণ : 'ধোঁয়াশা' = ধোঁয়া + কুয়াশা ।

ধোয়াঁ (পুরো শব্দ) + কুয়াশা'র অংশবিশেষ 'শা' যোগে সৃষ্ট ।

ম) ভুয়া শব্দ : বাংলা শব্দ ভান্ডারে এমন কিছু শব্দ আছে যাদের মূল নেই অথচ তাকেই মূল শব্দ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই ধরনের শব্দকে ভুয়া শব্দ বলে। যেমন- প্রোথিত শব্দটি বাংলাতে বহুল প্রচলিত, কিন্তু প্রথ বা প্রোথ বলে সংস্কৃতে কোন ধাতু নেই। প্রতিমা নিরঞ্জন শব্দটি ব্যাপক প্রচলিত অথচ নিরঞ্জন শব্দটি কোন মূল নেই।